বারো ইমামের অনুসারী শিয়াদের দৃষ্টিতে চার ইমাম (আবু হানিফা, মালেক, শাফে‘ঈ ও আহমাদ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ: চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ* [১৬৪হিঃ- ২৪১হিঃ]

বংশ পরিচয়: তিনি আবু আব্দুল্লাহ্ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল ইবন হিলাল আশশায়বানী আযযুহলী। তিনি বাবা-মা উভয়ের দিক থেকে শায়বানী কবিলার ছেলে। তার মা হচ্ছেন- সাফিয়্যা বিনতে মায়মুনা বিনতে আব্দুল মালিক আশশায়বানী (শায়বানী হচ্ছে বনু আমেরের শাখা কবিলা)।

ইমাম আহমাদ খাঁটি আরব কবিলাতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার বংশধারায় কোনো অনারবের অনুপ্রবেশ ঘটেনি কিংবা মিশ্রণও ঘটেনি। নাযার ইবন মা‘আদ ইবন আদনানের সাথে গিয়ে তার বংশধারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ তার ঐতিহ্যবাহী পরিবার থেকে আত্মসম্মানবোধ, সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, সুদৃঢ় ও মজবুত ঈমান ইত্যাদি মহান গুণাবলীর দীক্ষা পান। তিনি বেড়ে উঠার সাথে সাথে তার মাঝে এসব গুণাবলীও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন তিনি নানা সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তখন এসব গুণাবলী তার চরিত্রে অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠে।

জন্ম ও শৈশব: ১৬৪ হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসে ইমাম আহমাদ জন্মগ্রহণ করেন। তার মা তাকে পেটে করে ‘মার্ভ’[1] থেকে বাগদাদে আসেন। তার জন্ম হয় বাগদাদে। অল্প বয়সে তার বাবা মারা যান। তখন তার মা তার বাবার পরিবারে থেকেই তাকে লালনপালন করেন। বাগদাদে তার বাবার বসবাসের জন্য একখণ্ড জমি ছিল। আর অন্য একখণ্ড জমি থেকে সামান্য কিছু ফসল আসত। কিন্তু তা দিয়ে সংসারের খরচ ঠিকমত চলত না। এ কারণে ধৈর্য্য, সংযম ও অল্পেতুষ্টির মাঝে ইমাম আহমাদ বড় হন।

ইলম অর্জন ও তার ইলমী মর্যাদা: পরিবারের পক্ষ থেকে স্পৃহা পেয়ে ইমাম আহমাদ ইলমের পথে পা বাড়ান। পারিবারিক এ নির্দেশনার সাথে তার ব্যক্তিগত ঝোঁকপ্রবনতা খাপ খেয়ে যায়। সে সময় বাগদাদ ছিল ইসলামী বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র। ইমাম আহমাদ তার শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে হাদীস বিশারদদেরকে এবং তাদের পথকে পছন্দ করেন। তাই সূচনাতেই তিনি তাদের সান্নিধ্যে আসেন। তবে সম্ভবত তিনি মুহাদ্দিসদের সান্নিধ্যে আসার আগে ফিকহবিদদের পথ ধরে কিছু দূর এগিয়েছিলেন। যাদের পথ ছিল হাদীস ও কিয়াসের সমন্বিত পথ। বর্ণিত আছে তার ইলমের পথে হাতেখড়ি হয় কাযী[2] আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহর কাছে। যিনি আবু হানীফার ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, “আমি সর্বপ্রথম যার কাছ থেকে হাদীস লিখেছি তিনি হচ্ছেন আবু ইউসুফ।” কিন্তু এরপর তিনি একান্তভাবে মুহাদ্দিসদের পথে অগ্রসর হন। যারা শুধুমাত্র হাদীসের জন্য বিসর্জিত ছিলেন। হিজরী ১৭৯ থেকে ১৮৬ পর্যন্ত তিনি বাগদাদে থেকে হাদীসের জ্ঞান তলব করেন। বাগদাদের বড় মুহাদ্দিস হুশাইম ইবন বাশির ইবন আবু হাযেম আলওয়াসেতির (মৃঃ ১৮৩হিঃ) সান্নিধ্যে তিনি দীর্ঘ চার বছর অতিবাহিত করেন। এ সময় তার বয়স ছিল প্রায় ১৬ বছর। ইমাম আহমাদ তার কাছ থেকে হজ্জ অধ্যায়, তাফসীর অধ্যায়ের কিছু অংশ,

বিচার অধ্যায় এবং ছোট ছোট আরো কিছু অধ্যায় লিপিবদ্ধ করেন।

তার গুণাবলী: ইমাম আহমাদের এমন কিছু গুণ ছিল যে গুণগুলো তার এ প্রসিদ্ধির মূল কারণ এবং তার এ বিশাল জ্ঞানের মূল হেতু।

প্রথম গুণ হল- তীক্ষ্ম ও মজবুত স্মৃতিশক্তি। সাধারণভাবে সকল মুহাদ্দিসদের মধ্যে এ গুণ বিদ্যমান থাকে। বিশেষতঃ মুহাদ্দিসদের মধ্যে যারা ইমাম তারা এ গুণের অধিকারী। তার সমকালীন আলেমসমাজ তার তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির সাক্ষ্য দিয়েছেন। বরং তাকে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিশক্তির অধিকারী মনে করা হত।

দ্বিতীয় গুণ: এটি ইমাম আহমাদের উল্লেখযোগ্য গুণাবলীর একটি। যে গুণের কারণে তার সুনাম সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাহলো- ধৈর্য্য, দৃঢ়তা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা। এগুলো অতি মহান গুণাবলী। এ গুণাবলীর ভিত্তি হচ্ছে ইচ্ছার দৃঢ়তা, সিদ্ধান্তের অটলতা ও মজবুত মনোবলের উপর। এসব গুণাবলীর কারণে তিনি ইলমের পথে এত কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম হয়েছেন। অল্প ইলম নিয়ে তুষ্ট হন নি।

তৃতীয় গুণ: ইমাম আহমাদের অন্যতম আরেকটি গুণ ছিল আত্মসম্মানবোধ। আত্মসম্মানবোধের কারণে তিনি কিছু কিছু হালাল জিনিস থেকেও বিরত থাকতেন। তিনি খলিফাদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। কিন্তু তিনি তার কোনো এক ছেলেকে বলেছেন, তা গ্রহণ করা হালাল এবং সে অর্থ দ্বারা হজ্জ করাও জায়েয হবে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না আত্মমর্যাদার কারণে; হারাম মনে করে নয়। নিজের উপর এই সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে গিয়ে তিনি নিজের হাতের কামাই অথবা পৈতৃক জমিতে উৎপাদিত ফসল ছাড়া অন্য কিছু খেতেন না। আর তা করতে গিয়ে তাকে অনেক কষ্ট সইতে হত, আরাম-আয়েশের জীবন থেকে বঞ্চিত হতে হত। তাই তিনি ছিলেন দুনিয়াবিরাগ। আরাম-আয়েশের জীবনের প্রতি তার অবজ্ঞা ছিল ব্যাপারটি এমন নয়, বরং হালাল তালাশ করতে গিয়ে তিনি বিরাগী হয়েছেন। যেহেতু তিনি সন্দেহপূর্ণ সম্পদের মধ্যে হালাল তালাশ করতে যেতেন না। বরং তিনি হালাল তালাশ করতেন এমন সম্পদ থেকে যা পেতে গিয়ে তার আত্মসম্মান হানি হত না অথবা কোনো মানুষের কাছে ছোট হতে হতো না।

কখনো কখনো অর্থের বিনিময়ে রাস্তায় বহনের কাজ করতে বাধ্য হতেন; অথচ তিনি সেসময় মুসলিম উম্মাহ্র ইমাম।

মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে তোষামোদ, আত্মীয়তার প্রস্তাব, উপঢৌকন ইত্যাদি পরীক্ষার সম্মুখীন হন। আবার মু‘তাসিমের শাসনামলে নির্যাতন, সম্পর্কচ্ছেদ্, দুর্ব্যবহার ইত্যাদি পরীক্ষার সম্মুখীন হন। উভয় অবস্থাতেই তিনি ছিলেন সংযমী, নির্লিপ্ত, আত্মসম্মানী। উভয় অবস্থার মধ্যে তার কাছে পরেরটার চেয়ে আগেরটা ছিল বড় মুসিবত। বাস্তবিকই তিনি শাসকের সম্পদ গ্রহণ না করে নিজের বিরাগীপনা ও আত্মসম্মানের উপর অটল ছিলেন। এ বিষয়ে তার সম্পর্কে অনেক বিরল ঘটনা বর্ণিত আছে।

একবার মুতাওয়াক্কিলের উজির তার কাছে চিঠি লিখেন- “আমীরুল মুমেনীন আপনাকে এই উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন এবং আপনাকে তার দরবারে তশরীফ আনতে অনুরোধ করছেন। আল্লাহ্র দোহাই, আল্লাহ্র দোহাই, আপনি অমত করবেন না এবং তোহ্ফাটা ফেরত দিবেন না। যদি তা করেন তাহলে আপনার শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ পেয়ে যাবে।” এ পর্যায়ে এসে ইমাম আহ্মাদ অন্যায়-অন্ধকারকে নিরসণকল্পে শাসকের উপঢৌকন গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তারপরও তিনি নিজ হাতে ধরলেন না। বরং তার ছেলে সালেহকে নির্দেশ দিলেন অর্থটা নিতে এবং পরদিন আনসার-মুহাজিরদের অভাবী ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য গরীব-দুঃখীর মাঝে

বিতরণ করে দিতে। সম্ভবত ইমাম আহ্মাদ মনে করেছেন তার নিজের চেয়ে মুসলিম উম্মাহ্র সম্পদে এ সকল লোকদের অধিকার অনেক বেশী। কারণ তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

চতুর্থ গুণ: ইমাম আহমাদের আরেকটি গুণ ছিল ‘ইখলাস’। সত্য সন্ধানে ইখলাস বা আন্তরিকতা থাকলে আত্মা বৈষয়িক মোহ্ থেকে পবিত্র থাকে। ফলে অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, সঠিক বুঝ লাভ করা যায় এবং জ্ঞান ও হেদায়াতের আলোতে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তাই ইমাম আহমাদ রিয়া (লৌকিকতা) থেকে বেঁচে থাকতেন এবং এজন্য যারপর নাই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যখন কোথাও যেতেন শত চেষ্টা করতেন যেন লোকেরা তার আগমনের কথা শুনতে না পায়। তিনি বলতেন, “আমি মক্কায় যাচ্ছি। মক্কায় গিয়ে কোনো একটা পাহাড়ের গিরিপথে আস্তানা গাঁড়ব যেন কেউ আমাকে চিনতে না পারে।”

পঞ্চম গুণ: ইমাম আহমাদের আরেকটি গুণ ছিল, যে গুণের কারণে তার দার্স ও আলোচনা মানুষের অন্তরে স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছিল তা হল- গাম্ভীর্যতা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর ও শান্ত। তার এ শান্তপ্রকৃতি ও গাম্ভীর্যতার কারণে মানুষ তাকে সম্মান করত, শ্রদ্ধা করত। এ যেন হাদীসের বাণীর বাস্তব নমুনা “যে আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তাকে উপরে উঠান”। তার সমকালীন জনৈক ব্যক্তি বলেন, “আমি ইসহাক ইবন ইব্রাহীমের সাথে সাক্ষাত করেছি, অমুক অমুক বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করেছি কিন্তু আহমাদ ইবন হাম্বলের মত গম্ভীর্যতা আর কারো মাঝে দেখিনি। আমি একটা বিষয়ে কথা বলার জন্য তার কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার গাম্ভীর্যতা দেখে ভয়ে আমার কাঁপুনি এসে গেল।”

অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি: তার এ পরীক্ষা শুরু হয় খলিফা মামুনের এক চিঠির মাধ্যমে। ২১৮ হিজরীতে খলিফা মামুন বাগদাদের গভর্নরের কাছে এই মর্মে পত্র পাঠান যে, বিচারক ও খতীব পদে নিযুক্ত আলেমদেরকে একত্রিত করে কুরআনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর। তাদের মধ্যে যারা ‘কুরআন সৃষ্ট’[3] এ কথা বলবে না তাদেরকে পদচ্যুত কর। গভর্নর খলিফার আদেশ মত আলেমদেরকে সম্মিলিত করলেন। মাত্র চারজন আলেম ব্যতীত বাকী সবাই উক্ত কথা মেনে নেয়। তখন গভর্নর এ চারজন আলেমের উপর নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। তাদেরকে জেলে পুরে লোহার শিকল পরানো হয়। নির্যাতনের ফলে চারজনের দুইজন উক্ত কথা মেনে নেন। বাকী থাকেন আহমাদ ইবন হাম্বল এবং মুহাম্মদ ইবন নূহ। মামুন নির্দেশ দিল এ দুজনকে তার কাছে পাঠানোর জন্য। তখন গর্ভনর তাদের দুজনকে লোহার শিকল পরিয়ে মামুনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু বন্দীরা খলিফার দরবারে পৌঁছার আগে মামুন রাক্কা[4] নামক স্থানে ইহদাম ত্যাগ করে। এদিকে পথিমধ্যে ইবনে নূহ মারা যান। বাকী থাকেন শুধু ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ।

এরপর মু‘তাসিম ক্ষমতায় আসেন। তিনি সুঠাম দেহের মানুষ ছিলেন। এমনকি সিংহের সাথে পর্যন্ত কুস্তি করার ক্ষমতা রাখতেন তিনি। কিন্তু তার ইল্ম-কালাম কিচ্ছু ছিল না। কারো সাথে বিতর্ক করার সামান্যতম যোগ্যতাও তার ছিল না। কিন্তু তিনি তার ভাই মামুনকে শ্রদ্ধা করতেন, তাকে আদর্শ হিসেবে মানতেন, ফলে তার মতানুসারেই তিনি চললেন।

ইমাম আহমাদ জেলেই পড়ে থাকলেন। তার স্বাস্থ্য প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তবুও তিনি সার্বক্ষণিক ইবাদতে মশগুল থাকতেন, আল্লাহ্র স্মরণে রত থাকতেন। ইমাম আহমাদের ছেলে বর্ণনা করেন যে, তার বাবা জেলে থাকা অবস্থায় তিনি কিতাবুল ইরজা ও অন্যান্য কিতাব পড়াতেন এবং লোহার বেড়ী পরা অবস্থায় বন্দীদের নিয়ে নামাজে ইমামতি করতেন। শুধু পায়ের বন্ধনটা নামাজের সময় এবং ঘুমের সময় খুলে দেওয়া হত।

মু‘তাসিম তার পক্ষের আলেমদেরকে এবং তার নেতৃবৃন্দকে পাঠাতেন ইমাম আহমাদের সাথে বিতর্ক করার জন্য। ইমাম আহমাদ বিতর্কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি বলতেন, কুরআন অথবা সুন্নাহ্‌র দলীল ছাড়া কোনো মতৈক্য হবে না। একবার তাকে মু‘তাসিমের দরবারে উপস্থিত করা হয় এবং তার সামনে আলোচনা চলে। তখন তিনি প্রতিপক্ষকে বারবার শুধু এ কথাই বলেন, “আমাকে আল্লাহ্‌র কিতাব অথবা রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ্ থেকে একটা দলীল দিন।” অনেক উপঢৌকন ও পদের লোভ দেখিয়ে তারা তাকে বশ করার চেষ্টা করেছে। তদ্রুপ নানা প্রকার শাস্তির ভয় দেখিয়েও তারা তাকে বাগে আনার কসরত করেছে। কিন্তু কিছুতেই তারা তাকে তার মত থেকে সরাতে পারেনি।

তারা তার কাছে আলেমদেরকে পাঠাত। সেসব আলেমরা মিথ্যা ভান করে তার কাছে আসত। তিনি তাদেরকে বলতেন, “আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হত, তবুও তারা হার মানতেন না।” একবার তিনি বললেন, “আমি জেলকে ভয় পাই না, কিন্তু মারকে ভয় পাই।” তিনি এ ভয়ে উক্ত কথা বলেন- হয়ত সহ্য করতে না পেরে তার বুদ্ধির বিকৃতি ঘটবে। তখন তার সাথে জেলেবন্দী এক চোর তাকে বলল, “আমাকে অন্ততঃ বিশবার প্রহার করা হয়েছে। বেত্রাঘাতের সংখ্যা হবে হাজার হাজার। আমি দুনিয়ার জন্য তা সহ্য করতে পেরেছি; আর আপনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে সামান্য ক’টি বেত্রাঘাতকে ভয় করছেন। আপনি দুইটা বা তিনটা বেত্রাঘাত টের পাবেন, এরপর আর কিছুই টের পাবেন না।” এ চোরের কথায় তার কাছে বিষয়টাকে হালকা মনে হল।

এরপরও যখন মু‘তাসিম তাকে বশে আনতে পারল না তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যন্ত্রের ব্যবস্থা করল। যন্ত্রের উপরে তাকে সটান শুইয়ে দিয়ে তারা তাকে পিটাতে শুরু করল। প্রথম আঘাতেই তার কাঁধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং পিঠ থেকে পিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। তখন মু‘তাসিম তার কাছে গিয়ে বলল, আহমাদ! এই কথাটা বল। আমি নিজ হাতে তোমার বাঁধন খুলে দিব এবং তোমাকে অনেক উপঢৌকন দিব। কিন্তু ইমাম আহমাদ বললেন, আমাকে একটি আয়াত অথবা একটি হাদীস দিয়ে এর পক্ষে দলীল দাও।

তখন মু‘তাসিম জল্লাদকে বলল, “তোর হাতের উপর লানত হোক! আরো কঠিনভাবে শাস্তি দে।”

এরপর তাকে দ্বিতীয় আঘাত করা হল। তখন তার মাংস ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল।

মু‘তাসিম তাকে বলল, কেন নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছ? তোমার সাথীদের কেউ তো এ পথ বেছে নেয়নি।

মারওয়াযি জনৈক আলেম তাকে বলেন, ‘আল্লাহ্ তাআলা কি বলেননি, “তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।” তখন ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তাকে বলেন, মারওয়াযি দেখ দরজার বাইরে কারা? তখন মারওয়াযি প্রাসাদের আঙ্গিনায় বেরিয়ে দেখেন সেখানে অগনিত মানুষ কাগজ কলম নিয়ে বসে আছে। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা এখানে কি করছ? তারা বলল, ইমাম আহমাদ কি জবাব দেন আমরা তা লিখে রাখি। এরপর মারওয়াযি ফিরে এলেন। তারপর ইমাম আহমাদ বললেন, মারওয়াযি! আমি কি এদের সকলকে পথভ্রষ্ট করতে পারি? আমি নিহত হলেও এদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারব না।”

তারপরও যখন মু‘তাসিম ইমাম আহমাদকে বশ করতে পারছিল না তখন জল্লাদকে বলল, আরো কঠোরভাবে মার। তখন একজন জল্লাদ এসে মাত্র দুইটি বেত্রাঘাত করে চলে যেত। তারপর অন্যজন আসত। এভাবে মারতে মারতে তার দুই কাঁধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রক্তে তার পিঠ ভেসে যাচ্ছিল। যেন তিনি মরে গেছেন। তখন মু‘তাসিম ভাবল যদি তিনি মারা যান তাহলে লোকেরা বিদ্রোহ শুরু করবে। এই ভয়ে তাকে নির্যাতন করা বন্ধ করে তার

পরিবারের কাছে সমর্পণ করে।

তার অসুস্থতা ও মৃত্যু: মারওয়াযি বলেন, আবু আব্দুল্লাহ্ ২রা রবিউল আউয়াল বুধবার রাত্রে অসুস্থ হন। দীর্ঘ নয়দিন অসুস্থ ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি লোকদেরকে সাক্ষাত করার অনুমতি দিতেন। লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করে তাকে সালাম জানাত। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে সালামের উত্তর দিতেন...। তিনি নিরিবিলি থাকতেন না। কখনো বসে, কখনো শুয়ে নামাজ আদায় করতেন। ইশারা করে রুকু-সিজদা করতেন। একবার আমি তার জন্য বাসন ধরেছিলাম। দেখলাম তার পেশাব পেশাব নয়, বরং তাজা রক্ত। ব্যাপারটি আমি ডাক্তারকে জানালাম। ডাক্তার বললেন, উদ্বিগ্নতা ও দুঃশ্চিন্তা এই ব্যক্তির পেটকে ছিদ্র করে ফেলেছে। বৃহস্পতিবারে তার রোগ তীব্র আকার ধারণ করে। ঐদিন আমি তাকে ওজু করিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আঙ্গুলগুলো খিলাল করে দাও। শুক্রবার রাতে তিনি আরো বেশী দূর্বল হয়ে পড়েন। সকাল বেলা তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর খবর শুনে মানুষ চিৎকার করে কেঁদে উঠে। কান্নার রোলে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠে, পুরা দুনিয়া কেঁপে উঠে। রাস্তাঘাট, অলিগলি সব মানুষে ভরে যায়।

মারওয়াযি বলেন, “মানুষ জুমার নামাজ শেষে বের হওয়ার পর আমি লাশ বের করলাম।” আব্দুল ওহ্হাব আলওচ্ছাক বলেন, “জাহেলী যুগে বা ইসলামী যুগে কোথাও এত মানুষের সমাগমের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এত জনতার সমাগম হয়েছে যে পানির অভাবে মানুষকে তাইয়্যাম্মুম করতে হয়েছে এবং অতি ভিড়ের কারণে তা বিপজ্জনক এলাকায় পরিণত হয়েছে। লোকেরা তাদের বাড়ীর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে যারা ওজু করতে চায় তাদেরকে ওজু করার জন্য ডাকাডাকি করেছে।”আল্লাহ্ তাআলা ইমাম আহমাদকে তার অশেষ রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিন, তার জান্নাতে স্থান দিন এবং ইমাম আহমাদের সাথে আমাদেরকেও তার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

>

ফুটনোট

* মুহাম্মদ আবু যুহরার “আহমাদ ইবন হাম্বল” শীর্ষক গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়ে জীবনীটি লেখা হয়েছে।

[1] মার্ভ হচ্ছে- পারস্যের একটি শহরের নাম। - অনুবাদক।

[2] আরবী ভাষায় বিচারককে কাযী বলা হয়। - অনুবাদক।

[3] আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আকীদা হল- “কুরআন সৃষ্ট নয়। কুরআন আল্লাহ্র বাণী।– [অনুবাদক] আর আল্লাহর বাণী আল্লাহর গুণ। আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পর্কিত কোনো কিছু সৃষ্ট নয়। এটিই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকীদা। [সম্পাদক]

[4] ইরাকের একটি শহরের নাম। -অনুবাদক

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9867

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন